Signature of the invigilator

Roll No.

কবি
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

অন্ত্যজশ্রেণীর মানুষ নিতাই- এর কবি হিসাবে আত্মপ্রকাশের এক প্রাসঙ্গিক আলোচ্য:

রবীন্দ্র-শরৎ উত্তরকালের বাংলা কথাসাহিত্যে ত্রয়ী বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যের বিষয় ছিল ঈশ্বর-প্রকৃতি-মানুষ। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিষয় ছিল ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন তত্ত্ব ও মার্কসীয় শ্রেণী সংগ্রাম। আর তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যের বিষয় ছিল মূলত: রাঢ়বাংলার মানুষের কাহিনী। তারাশঙ্কর জমিদার বংশের সন্তান হয়েও সারাজীবন কাটিয়েছেন মানুষের মাঝে। ঘুরে বেড়িয়েছেন গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। প্রত্যক্ষ করেছেন গ্রামবাংলার অতি সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা, রীতি-নীতি ইত্যাদি বিষয়। ব্যক্তিজীবনের সেই সব প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়েছেন তাঁর ছোটগল্প ও উপন্যাসে। ফলস্বরূপ তারাশঙ্করের বেশির ভাগ ছোটগল্প ও উপন্যাস হয়ে উঠেছে অন্ত্যজশ্রেণীর মানুষের এক একটি কাব্যগাথা। অন্ত্যজশ্রেণী বলতে সমাজের চোখে নিচু স্তরের মানুষ। যেমন- সাঁওতাল, ডোম, চণ্ডাল, কাহার, বাগদি, বোষ্টম, বাউল, কবিয়াল দলের মানুষ ইত্যাদি। তারাশঙ্করের 'কবি' (১৯৪৪ খ্রী:?) উপন্যাসের

নায়ক নিতাইচরণ তেমনি একজন অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষ, জাতিতে ডোম, ডাকাতবংশে জন্ম। কিন্তু তাহলেও শেষপর্যন্ত নিতাইয়ের 'কবি' হিসাবে আত্মপ্রকাশের এক অশ্রুসিক্ত আলেখ্য হয়ে উঠেছে এই উপন্যাসটি।

নিচুবংশে জন্মানো নিতাইচরণ গ্রামের সবাইকে চমকে দিয়ে কবি হয়ে ওঠে। সে কবিয়ালদের দোহার হিসাবে ইতিপূর্বে টুকটাক কাজ করেছিল। কিন্তু আজ নিজ গ্রামের এক অনুষ্ঠানে পালাগানের আসরে এক প্রতিষ্ঠিত কবিয়াল অনুপস্থিত হলে, নিতাইর সুযোগ আসে কবিয়াল হিসাবে আত্মপ্রকাশের। খিস্তি-খেউড় বাদ দিয়ে রুচিসম্মত গান করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু প্রতিপক্ষ মহাদেব কবিয়ালের কাছে হেরে যেতে হয়েছিল। শুধু তাই নয় অনেক গালমন্দও খেতে হয়েছিল। কিন্তু নিতাই হেরে গিয়েও জিতে গিয়েছিল। কবি হিসাবে আত্মপ্রকাশের পথটা পরিষ্কার হয়েছিল এখান থেকেই। মেলাতে আসা বাবুরা পর্যন্ত অবাক— 'ডোমের ছেলে পোয়েট'!

নিতাইচরণের পারিবারিক পেশা হল ডাকাতি করা। পুরুষানুক্রমে এই পেশায় যুক্ত বংশের সন্তানেরা। কিন্তু নিতাই হল অন্যরকমের। মায়ের অনুরোধ, মামার শাসানিকে পর্যন্ত তোয়াক্কা করেনি সে, নাম লেখায়নি ডাকাতদলে। গ্রাম্য পাঠশালায় সাধ্যমতো লেখাপড়া করেছে। ঘরের সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদ হলে ঘরবাড়ি ছেড়ে স্টেশনে গিয়ে থাকতে শুরু করে। সেইখানেই আলাপ হয় রাজার সাথে। রাজা রেলের একজন কর্মী। রাজার সঙ্গে নিতাইয়ের গভীর বন্ধুত্ব

তৈরী হয়। নিতাইকে সে 'ওস্তাদ' বলে ডাকে।

রাজার শ্যালিকার সঙ্গেই নিতাইয়ের সঙ্গে ঠাকুরঝির পরিচয় হয়। ঠাকুরঝি রাজার শ্যালিকা, পাশের গ্রামের বধূ, এই গ্রামে সে দুধের যোগান দিত প্রতিদিন। নিতাইও রোজ দুধ নেয় তার কাছে। গায়ের রং কালো বলে সবাই তাকে ঠাট্টা করতো। কিন্তু নিতাইয়ের চোখে —

"কালো কেশে রাঙা কুসুম
হেরেছ কি নয়নে?"

— কিংবা — "কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকলে কাঁদ ক্যানে?" নিতাইয়ের গানের নীরব শ্রোতা ঠাকুরঝি। ধীরে ধীরে দুজনের মধ্যে গড়ে ওঠে প্রেমের সম্পর্ক। বাধা হয়ে দাঁড়ায় সমাজ। সবকিছু জানাজানি হলে বন্ধু রাজন নিতাইয়ের সঙ্গে ঠাকুরঝির বিয়েও দিতে চেয়েছিল। কিন্তু নিতাই কবি মানুষ, সুন্দরের পূজারী। তাই বন্ধুকে বলে— "মানুষের ঘর কি ভেঙে দিতে আছে রাজন? ছি:!" বুকভরা বেদনা নিয়ে দেশান্তরী হয় —

"চাঁদ তুমি আকাশে থাকো আমি তোমায়
দেখব খালি।
ছুঁতে তোমায় চায়নাকো হে চাঁদ,
তোমার সোনার অঙ্গে লাগবে কালি।।"

নিতাইয়ের জীবনের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয় ঝুমুর দলের সঙ্গে এসে। বসন/বসন্তের জন্যই নিতাই এখানে এসেছে। যদিও গ্রামে থাকাকালীন অবস্থায় এইদলের সাথে ও বসনের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। ঠাকুরঝির ভালোর জন্য দেশান্তরিত নিতাই এই ঝুমুরদলে এসে আশ্রয় নেয়। বসন্তের সদা হাস্যময়ী ও তীব্র ছবি নিতাইকে মুগ্ধ করে। বসন্তের মধ্যে নিতাই ঠাকুরঝির ছায়া দেখতে পায়। বসন্ত দেহোপজীবিনী হলেও তার মানুষের প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। — নিতাই মনে কবিতা বেরিয়ে আসে—

'বঙ্কিমগ্রীবা হরি বাঁকা তোমার মন,
কুটিল কৌতুকে তুমি হাস কর নয়,
অঘটন কর সংঘটন।'

— বসনের জন্যই শিল্পী নিতাই ঝুমুরদলে যোগ দেয়। অশ্লীল গান বাজনা এবং গানের সঙ্গে নারীদের অশ্লীল নৃত্য পরিবেশন করতো এই ঝুমুরদলের শিল্পীরা। নারীরা প্রত্যেকেই দেহব্যবসায় যুক্ত ছিল। যাইহোক নিতাইকে তাঁর স্বভাবসুলভ কবিত্বকে চাপা দিয়ে, দলের চাহিদা অনুযায়ী গানরচনা ও পরিবেশন করতে হতো। নিতাইয়ের মুখে এখন খিস্তি-খেউড়ের বন্যা ছোটে। এভাবেই নিতাইচরণ কবিয়াল হিসাবে জনপ্রিয়তা অর্জন করে। বসনের সঙ্গে আঁটছড়া সম্পর্কে বাঁধে নিতাই। কিন্তু বসন মারণব্যাধিতে আক্রান্ত। বসন দেহোপজীবিনী

মারণব্যাধিতে আক্রান্ত, তবুও নিতাই বসনকে মনেপ্রাণে ভালোবাসে। নিতাই জানে এর পরিণতি। সেইজন্য নিতাইয়ের কণ্ঠে আক্ষেপের সুরে গান হয়ে বেরিয়ে আসে—

"এই খেদ মোর মনে মনে,
ভালোবেসে মিটিল না আশা-কুলাল না এ জীবনে।
হায়! জীবন এত ছোট কেনে!
এ ভুবনে?"

— বাস্তবিক অল্প কিছুদিনের মধ্যে নিতাইয়ের কোলে মাথা রেখে মারা যায়।

ছোটবেলা থেকেই নিতাই নিজের সমাজ-সংসার থেকে আলাদা থাকতে চেয়েছে। বাপ-দাদার পেশা ডাকাতিকে সে মনেপ্রাণে ঘৃণা করেছে। তার মন ছিল সহজ-সরল সুস্থ জীবন-যাপন করা। তা করতে গিয়ে সে নিজেই আবিষ্কার করেছেন নিজ অন্তরের কবিসত্তাকে। সে মনে মনে একজন প্রতিষ্ঠিত কবিয়াল হতে চায়। গ্রামের এক অনুষ্ঠানে সে সুযোগ আসে। কমবেশি খ্যাতি প্রশংসা-সম্মান পায়। তারপর ঠাকুরঝিকে কেন্দ্র করে নিতাই কবিসত্তা বিকশিত হয়ে ওঠে। কিন্তু তাদের প্রেম সম্পর্কে বাধা হয়ে দাঁড়ায় সমাজ ও নিতাইয়ের [illegible]

মন। ফলে ঠাকুরঝিকে হারাতে হয়। ঠাকুরঝি চরিত্রটি অর্থাৎ নিতাইয়ের কবিত্বসত্তা বিকশিত হয়ে ওঠে ঝুমুরদলের শিল্পী বসনকে কেন্দ্র করে। কিন্তু বসনকেও হারাতে হয় মারণব্যাধির কারণে। তখন তো নিতাইয়ের কাছে জীবন সংসার ছোটো হয়ে যায়। ছোট হয়ে যায় জীবনের মানে। তাই তো সে গেয়ে ওঠে — "হায়। জীবন এত ছোট কেনে! এ ভুবনে ?" তখন নিতাইয়ের মতো পাঠক তথা আমাদেরও মনে প্রশ্ন আসে — 'হায়। জীবন এত ছোট কেনে! এ ভুবনে ?" 'কবি' উপন্যাস খুনী ডোমবংশের সন্তান নিতাইয়ের কবিয়াল হিসাবে আত্মপ্রকাশের এক অসাধারণ বেদনাময় অশ্রুসিক্ত আলেখ্য।

ঠাকুরঝি চরিত্র : প্রকাশের দিক থেকে 'কবি' উপন্যাস তারাশঙ্করের ২২-তম উপন্যাস। উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৪৩ খ্রী:। ১৯৪২ খ্রী: মার্চের থেকে প্রবাসী পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। যাইহোক, 'কবি উপন্যাসটি' আসলে 'কবি ছোটগল্পের' বিস্তৃত রূপ। ১৯৪০ খ্রী: প্রবাসী পত্রিকায় ছোটগল্প হিসাবে 'কবি' প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। ছোটগল্পে কবির কাহিনী ঠাকুরঝি প্রসঙ্গ পর্যন্ত ছিল। আর উপন্যাস 'কবি' তে নতুন করে যুক্ত হয়েছে বসন্ত/বসন প্রসঙ্গ। নিচুবংশের সন্তান নিতাইচরণের কবিয়াল হয়ে ওঠার পেছনে যেদুজন নারীর সক্রিয় ভূমিকা ছিল তাদের একজন ঠাকুরঝি, অন্যজন বসন।, নিতাই-এর জীবনে দুই মানসসুন্দরী।

'কবি' উপন্যাসের মূল উপজীব্য বিষয় হল- হলে: নীচ বংশের সন্তান নিতাইচরণের কবিয়াল হয়ে ওঠার কাহিনী। নিতাই ছিল 'গোবরে পদ্মফুল'। বংশের জঘন্য পেশাকে গ্রহন না করে প্রকৃত ভালো হয়ে সম্মানের সঙ্গে বাঁচতে চেয়েছিল। তাই বাড়ি-ঘর ছেড়ে ~~রে~~ রেলস্টেশনে আশ্রয় নেয়। সেখানের পয়েন্টসম্যান রাজার সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়, এই স্টেশনে অবস্থানের পরেই সুযোগ পেয়ে যায় নিতাই, গ্রামের আসরে কবিগান গাওয়ার। গ্রামের বামুন, দর্শকেরা রীতিমতো প্রশংসা করেছিল নিতাইয়ের। ~~নিতাই~~ ~~প্রথম~~ মাস্তান নয়; একজন উদীয়মান ~~কবিয়াল~~ গ্রামের ~~এক~~ এই

(*) "পনের-ষোল বছরের একটি কিশোরী। মেয়েটির রঙ কালো। কিন্তু দীঘল দেহ ভঙ্গিতে ভুঁইচাঁপার সতেজ সরল ডাঁটার মত একটি অপরূপ শ্রী। মেয়েটির --- পরনে দেশী তাঁতের মোটা সুতার খাটো কাপড়। মোটা সুতার খাটো কাপড়খানির আঁটোসাঁটো বেষ্টনীর মধ্যে তাহার ছিপছিপে কালো দীঘল দেহখানির আয়তিক বাঁকগুলিকে প্রকট করিয়া যেন একটি কোঁদামাটির পুতুলের মত দেখায়।"

—x—

তার দিদির সাথে

কবিগানের আসরে দর্শক হিসাবে ঠাকুরঝিও উপস্থিত ছিল। সেও কম অবাক হয়নি। তবে তার অবাক হওয়ার প্রকাশ ভঙ্গিটা একটু অন্যরকমের। সে কি নিতাইয়ের গান শুনে কেবল খিকখিক করে হেসেছিল। ~~সাথে~~ দিদি মুখঝামটা দিলে হাসি বন্ধ করেছিল। কিন্তু আসরে নিতাইয়ের কবিগান শুনে ঠাকুরঝির মন প্রসন্নতায় ভরে গিয়েছিল। আর তা নিয়েই বাড়ি ফিরেছিল।

নিতাইয়ের সঙ্গে ঠাকুরঝির পরিচয় হয়েছিল বন্ধু রাজেনের সুবাদে। রাজেনের শ্যালিকা, ঠাকুরঝি নামেই ডাকতো সবাই। নিতাইও এইনামেই ডাকে। পাশের গ্রামের বধূ সে। গায়ের রং কালো ঠাকুরঝির, মুখে হাসিটা লেগেই থাকতো। ~~সর্বোপরি~~ ~~মতো~~ ~~আঁটোসাঁটো কাপড়ে তরুণী বধূ, ছিপছিপে গড়নের দিঘির~~ ~~মেয়ে~~ উপন্যাসিক ঠাকুরঝির সঙ্গে পাঠকের পরিচয় করিয়ে দেন এইভাবে- ~~কেশদামের কুন্ড সাজার মত নর্ম, যেন তাহার~~

~~" দীঘল দেহের অনুকরণ"~~

— গায়ের রং কালো বলে সবাই, বিশেষত জামাইবাবু রাজেন ~~র~~ তাকে আলকাতরার সঙ্গে তুলনা করে ঠাট্টা করলেও নিতাই কবিয়াল কিন্তু এই কালোরঙের প্রশংসা করে গান বেঁধেছে-

"কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকলে কাঁদ কেনে?
কালো কেশে রাঙা কুসুম হেরেছ কি নয়নে?"

— নিতাইয়ের গানে ঠাকুরঝির মন ভরে ওঠে। ~~আবার~~ আর তাছাড়া ঠাকুরঝি প্রতিদিন দুধের যোগান দিতে এই গ্রামে আসতো। নিতাইও দুধ নিতো। এভাবেই নিতাই ও ঠাকুরঝির

ADDITIONAL SHEET

Signature of the invigilator

Roll No.

(9)

অর্থাৎ স্বকীয়া প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। নিতাইয়ের গানের একজন নীরব ভক্ত সে। নিতাইয়ের গান, নিতাইয়ের কথা শুনতে এবং নিজের কথা শোনাতে বলেই ঠাকুরঝি প্রতিদিন আসাযাওয়ার দুধ দিয়ে এসে নিতাইয়ের আস্তানাতে আশ্রয় নিত। নিজের মতো ডাকতে উত্তর খাওয়ার সময় ঠাকুরঝি নানা বলতো। সংসারের, ঘরের সমস্ত বৃত্তান্ত যেন নিতাইকে জানাতে পারলেই তার সুখ।—

"সংসারের তুচ্ছতম সংবাদটি পর্যন্ত ঠাকুরঝি তাহাকে বলিয়াছে। দেওয়ালে কোথায় একটি সূচ গাঁথা আছে, নিতাই সেটি গিয়া স্বচ্ছন্দে চোখ বন্ধ করিয়া লইয়া আসিতে পারে।"

— অত্যন্ত সাদাসিধা মেয়ে ঠাকুরঝির মনে লেগেছিল নিতাইকে। এভাবেই দুজনের মধ্যে প্রেম সম্পর্কের গভীরতা বাড়ে। নিতাইয়ের আর্থিক অবস্থা অবনতিতে ঠেকলে, আর ঠাকুরঝির কাছে দুধ নিতে পারবে না বলায়; ঠাকুরঝি তাকে এমনি বিনা পয়সাতেই দুধ দেবে বলে জানিয়ে দেয়। কেননা ঠাকুরঝিরও একটি বাবার বাড়ি থেকে আনা নিজস্ব গাই আছে— তার দুধ নিতাইকে দেবে। বাস্তবিক ঠাকুরঝি নিতাইকে মনে-প্রাণে ভালোবেসেছিল।

নিতাই কবিয়ালও ঠাকুরঝিকে নীরবে ভালো-বেসেছিল। কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়ায়— প্রতিনায়িকা বসনের আবির্ভাব এবং বৃহত্তর অর্থে সমাজ। রাজেন একদিন হঠাৎ করেই ট্রেন থেকে ঝুমুরদলের শিল্পীদের নামিয়ে আনে গান-বাজনা হবে বলে। সেখানে মান-লাঞ্ছনাও হয়েছিল নিতাইয়ের সঙ্গে পাল্লা

দিয়ে। ঝুমুরদলের বসন গান শেষ হলে নিতাইয়ের ঘরে এসে আশ্রয় নেয়। আর নিতাইও তার খোঁজ করতে এসে দেখে বসন তারি ঘরের বিছানায়। অন্যদিকে ঠাকুরঝি দর্শক হিসাবে উপস্থিত থেকে গান শুনেছে; লক্ষ্য করেছে নিতাইয়ের উপর ঢলেপড়া ভাব। আর তারপর নিতাইয়ের ঘরে দুজনকে একসঙ্গে আবিষ্কার করা। রাত্রির অন্ধকারে ছায়ামূর্তির মতো অনুসরণ করে প্রত্যক্ষ করেছিল নিতাইদের। —

এরপরে ঠাকুরঝির ইতিহাস সংক্ষিপ্ত। তিন-চারদিন ধরে দুধ দিতে না এলে নিতাই জানতে পারে ঠাকুর অসুখ করেছে। পরে রাজেনের স্ত্রীর মারফত জানা যায় ঠাকুরঝির প্রকৃত অসুখের কথা। ঠাকুরঝির পাগলামি অবস্থায় পাগলপ্রায়। এই অবস্থায় অকপটে সব কথা বলেছে সবার কাছে। শুনে নিতাইয়ের মন খারাপ হয়ে যায়। বন্ধু রাজেন ঠাকুরঝির সঙ্গে নিতাইয়ের নতুন করে বিয়ে দেবে বললেও তাতে রাজী হয়নি নিতাই। তাই নিতাই বন্ধুকে বলে — "মানুষের ঘর কি ভেঙে দিতে আছে রাজেন? ছি:।" ঠাকুরঝির ভালোর জন্য নিতাই একবুক বেদনা নিয়ে দেশান্তরী হবে —

"চাঁদ তুমি আকাশে থাকো আমি তোমায় দেখবো খালি।
ছুঁতে তোমায় চাইনাকো হে চাঁদ,
তোমার সোনার অঙ্গে লাগবে কালি।"

— ঠাকুর পাগলামি দশা থেকে ঠাকুরঝির মৃত্যু হয় – একথা দেশান্তরী নিতাই জানে না। কিন্তু একদা –

"নিতাই নির্দিষ্ট স্থানে; যেখানে লাইনটা বাঁক ঘুরিয়াছে:

সেইখানে দৃষ্টি আবদ্ধ করিয়া দাঁড়ায়, সহসা সেখানে ক্ষুদ্র একটি চলন্ত রেখার মত রেখা দেখা যায়, রেখাটির মাথায় একটি স্বর্ণবর্ণ বিন্দু। স্বর্ণবিন্দুশীর্ষ ক্ষুদ্র চলন্ত রেখাটি আগাইয়া আসিতে আসিতে ক্রমশ পরিণত হয় একটি মানুষে। হাতে কাচা তাঁতের মোটা সুতার খাটো কাপড়খানি আঁটসাঁট করিয়া পরা সে একটি কালো দীর্ঘাঙ্গী মেয়ে এবং তাহার মাথায় একটি ঝকঝকে মাজা সোনারবর্ণের পিতলের ঘটি। ঘটিটি সে ধরে না — একহাতে মাথার ঘোমটা, অন্যহাতটি দোলে, সে দ্রুতপদে অবলীলাক্রমে চলিয়া আসে।”

— ঠাকুর অনুপস্থিতিতে, ঠাকুরঝির এই ছবিটি পাঠক তথা আমাদের মনের ক্যানভাসে আঁকা হয়ে থাকবে। সহজ সরল স্বাস্থ্যবতীর পরকীয়া প্রেমের করুণ পরিণতি পাঠকমনকে ভারাক্রান্ত অশ্রুসিক্ত করে তোলে। ঠাকুরঝি নেই। কিন্তু ঠাকুরঝি বেঁচে আছে নিতাইয়ের অনুভূতিতে, নিতাইয়ের গানে, সর্বোপরি পাঠকের অন্তরে — 'চাঁদ দেখে কলঙ্ক হবে বলে কে দেখে না চাঁদ?'